ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, February, 2026, Page No. 110- 119
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.276

অপরাধ ও অপরাধী মনস্তত্ত্ব: প্রসঙ্গ সায়ন্তনী পূততুন্ডের বাংলা গোয়েন্দা উপন্যাস ‘সর্বনাশিনী’

আবু আসিম, *গবেষক, আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ, বাংলা বিভাগ, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর প্রদেশ, ভারত*

Received: 23.12.2025; Accepted: 03.01.2026; Available online: 28.02.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Just as a human being gradually grows up from the postnatal stage acquiring ideals, morality, humanity, and a conscience-driven mindset, alongside this process, small initial criminal tendencies within a person also gradually give rise to crime and criminal psychology. The earliest emergence of criminological thought began in Europe, and its clearer and more complete expression was developed by several contemporary criminologists such as Cesare Beccaria, Jeremy Bentham, Enrico Ferri, Cesare Lombroso, and Raffaele Garofalo. In addition, the name of the Indian criminologist Dr. Panchanan Ghoshal deserves special mention. In his book Criminology (1963), he primarily divided criminology into three branches, among which the psycho-analytical theory under criminal psychology or psychological criminology is particularly significant. In this context, the concepts of Id, Ego, and Super Ego proposed by the renowned philosopher Sigmund Freud in his psychoanalytic theory are especially noteworthy.

As a result, the crimes committed by the criminals in the detective novel Sarbanashini (2019) by novelist Sayantani Putatunde, and the subtle psychological analysis of those crimes, form the central theme of my article. Through a descriptive and analytical discussion, I aim to present the intricate artistry of criminal psychology, one of the most important branches of criminology or criminal science, as reflected in this novel.

From the very beginning of the novel, a sense of ambiguity is created, where a recurring question arises—whether the criminal is a man or a woman. This is because in our so-called society, we are accustomed or conditioned to assume that any crime must be committed by a man. The possibility that a woman could be behind such crimes is usually considered only as an alternative or secondary thought. However, in the detective novel Sarbanashini, the criminal is ultimately identified as a woman. By utilizing her criminal psychological thinking and intelligence, she reveals her identity through her Facebook profile under the name “Sarbanashini” and commits multiple murders. Her real name, however, is Priya Bajaj. Driven by her own vengeful criminal mindset and intellect, she murders several prominent wealthy businessmen of the city. In addition, she also kills her own father Andrew Bajaj and her father-in-law Vijay Jaiswal.

Thus, in the light of overall theories and facts, through an analytical discussion of Sayantani Putatunde’s novel Sarbanashini, I will attempt to highlight criminal psychology and the nature of criminal behavior as portrayed in the narrative.

Keywords: Female Criminal Psychology, Criminology, Serial Killing, Twenty-First Century Era, Brutality, Criminology (Criminal Science)

মানুষ জন্মপরবর্তী সময় থেকে ধীরে ধীরে আদর্শ, নৈতিকতা, মনুষ্যত্ব ও বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মানসিকতা নিয়ে যেমন বড় হয়, ঠিক তেমনি তার পাশাপাশি মানুষের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ছোট ছোট অপরাধপ্রবণতাও তৈরি হয়, যদিও সেই ছোট ছোট অপরাধপ্রবণতা গুলিকে মানুষের সঠিক চিন্তা, অদর্শ, মনুষ্যত্ব ও নৈতিক-মানসিকতা কিছুটা হলেও সুপ্ত করে রাখে, কিন্তু বিশেষক্ষেত্রে ওই সুক্ষ অপরাধগুলিই আবার পরবর্তীতে বড় আকার ধারণও করতে পারে, যা তখন মানুষের অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়। আর এই অপরাধ প্রবণতা যদি একবার অভ্যাসে পরিণত হয় তাহলে অপরাধীকে ওই অপরাধমূলক আচরণ থেকে নিষ্ক্রিয় করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। অপরাধীদের অপরাধমূলক বিভিন্ন কার্য করার পিছনে অবশ্যই কিছু কারণ থেকেই যায়, কিন্তু তাই বলে প্রত্যেক অপরাধীরাই যে কোনো কারণ বসতই অপরাধকার্যে নিযুক্ত হয়ে থাকে সেটা একদমই ভুল ও ভ্রান্ত ধারণা ফলত। একুশ শতকীয় ঔপন্যাসিক 'সায়ন্তনী পূততুন্ডে'র 'সর্বনাশিনী' (২০১৯) নামক গোয়েন্দা উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে মূলত অপরাধীদের অপরাধ ও তাদের সূক্ষ মনস্তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণই আমার প্রবন্ধের মূল বিষয়। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসগুলিতেই কঠিন বাস্তবতা ও বর্তমান সাম্প্রতিক বিভিন্ন সমাজ সমস্যার কথা উঠে এসেছে যার মধ্যে তিনি বিশেষত গোয়েন্দা উপন্যাস গুলিতে অপরাধের চাকচিক্যপূর্ণ জগত ও অপরাধীর অপরাধ-মনস্তত্ত্বকে অনবদ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মূলত 'অপরাধ' শব্দটির মধ্যে দিয়ে আইনবিরুদ্ধ বা অসামাজিক কাজকর্মকেই বুঝিয়ে থাকে। সমাজব্যবস্থার প্রত্যেকটি পদে পদে কোনো না কোন ভাবে এ অপরাধ বিদ্যমান। অপরাধের বৃদ্ধি সমাজ উন্নয়নের পক্ষে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে ও সমাজকে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়। সমাজকেন্দ্রিক প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষের চিন্তা ও চেতনা অনুযায়ী অপরাধতত্ত্ব এমন একটি প্রকৃতি বা আচরণ যা সমাজের যে কোনোরকম নিয়মব্যবস্থা ও সংস্কৃতিকে ভঙ্গ করে। আমেরিকান আপরাধতত্ত্ববিদ 'ক্ল্যাড্ওয়েল্' এই অপরাধতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেঁন,

> "Those acts or failures to act that are considered to be so detrimental to the well-being of a society, as judged by its prevailing standards, that action regarding them cannot be entrusted to private initiative or to haphazard methods but must be taken by an organized society in accordance with tested procedures"[১]

অপরাধজগতের প্রাথমিক আবির্ভাব ও তার পুরোপুরি ধারণা প্রথম ইউরোপ গবেষণা দ্বারাই হয়েছিল এবং তার উন্নতিসাধনও এই ইউরোপের হাত ধরেই। ষোলো শতকের পরবর্তী সময় থেকে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসের আঙিনায় দীপ্তময় জাগ্রতমূর্তি ধারণ করেছিল আর সেই শিল্পবিপ্লবের একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া ছিল অপরাধজগতের ওপর। বিশেষতঃ ইংল্যান্ড ও ইউরোপের বাকি দেশের অর্থনৈতিক অপরাধের ওপর। আর এই অপরাধতত্ত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটালেন একাধিক অপরাধতত্ত্ববিদ যেমন- 'সীজার বেকারিয়া' (১৭৩৮-১৭৯৪), 'জেরেমি বেন্থাম' (১৭৪৮-১৮৩২), 'এনরিকো ফেরী' (১৮৫৯-১৯২৮) 'সীজার লোম্ব্রোস' (১৮৩৬-১৯০৯), 'রাফাকল্ গ্যারোফল্াস' (১৮৫২-১৯৩৪)। এঁরা প্রত্যকেই অপরাধ বিজ্ঞানের কালজয়ী ব্যবহারিক বিদ্যালয়ের অগ্রদূত। অপরাধজগতের বিষয়গত ধারণা ও তার গবেষণা শুধুমাত্র ইউরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, অপরাধের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়গত ধারণাকে সামনে রেখে আমেরিকাতেও তার গবেষণা শুরু হয়। আমেরিকা অর্থনৈতিক দিক থেকে একটি উন্নত দেশ এবং তারা স্বাধীনতাকালীন সময় থেকেই নিজেদের উপর ঘটিত বিভিন্ন অপরাধের প্রতক্ষ্যদর্শী। ফলত স্বাভাবিক ভাবেই এই দেশটি অপরাধবিদ্যা কেন্দ্রিক বহু বিদ্যালয় স্থাপন করতে সহায়ক হয়েছে, যাতে করে 'অপরাধশাস্ত্র' বা 'অপরাধবিজ্ঞান' গবেষণার মধ্যে দিয়ে তারা নতুন পথের দিশারি হতে পারে। আমেরিকাতে আপরাধশাস্ত্রের প্রাথমিক বা আদি ধারণার যে জন্ম

হয়েছিল তা প্রকৃতভাবে পূর্ণতালাভ করেছিল প্রধানত দু-জন অপরাধবিদের হাত ধরে তাঁরা হলেন 'এডুইন এইচ সাদারল্যান্ড' ও 'জন গিলিন'। সাদারল্যান্ড শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছেন। এই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়কে অপরাধশাস্ত্রের উন্নতিসাধন ও অপরাধবিজ্ঞানের আধুনিক পথ প্রদর্শককারী হিসাবে দেখা হয়। এছাড়া অমেরিকাতে অপরাধশাস্ত্রের শিক্ষাদানের জন্য প্রথম পাঠ্যবই সংকলিত হয় ১৯৮১ সালে, যা 'মরিস পারমেল' রচনা করেছিলেন। অর্থাৎ, 'আপরাধশাস্ত্র' হল অপরাধবিজ্ঞানের একটি ব্যবহারিক ও গতিশীল শাখা, যা সমাজের বিভিন্ন অপরাধগুলিকে সুক্ষাতিসুক্ষ ভাবে বিশ্লেষণ করে অপরাধের পিছনের লুকিয়ে থাকা বিভিন্ন কারণ গুলিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরে। অপরাধশাস্ত্র আপরাধীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণ ও তাদের পরিবেশকে চিহ্নিত করে। যেমন- লিঙ্গ, বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষা, পেশা, অভিপ্রায়, প্রকৃতি ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সমূহ ইত্যাদি।

ইউরোপ-আমেরিকারকৃত অপরাধ বিষয়ক গবেষণা থেকে জানতে পারা যায় আপরাধকেন্দ্রিক একাধিক বিভাগের প্রসঙ্গ- সামাজিকেন্দ্রিক অপরাধ, অর্থনীতিমূলক অপরাধ, রাজনীতিমূলক অপরাধ, ধর্মীয় অপরাধ, হত্যাপরাধ, সেইসঙ্গে বিভিন্ন যৌনপরাধ, পাচারকার্য মূলক অপরাধ ও কিশোর অপরাধ ইত্যাদি। কিন্তু এক্ষেত্রে আবার ভারতীয় অপরাধতত্ত্ববিদ 'ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল' তিনি তাঁর 'অপরাধবিজ্ঞান' (১৯৬৩) নামক বইটিতে বলেছেন,

> "ক্রিমিনোলজি পৃথিবীর সর্বদেশে মূলত একরূপ হলেও দেশভেদে কিছু বিষয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। আমাদের অপরাধীরা সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার অপফল তথা বাইপ্রোডাক্ট। এজন্য য়ুরোপের পরিপ্রেক্ষিতে য়ুরোপীয়দের দ্বারা রচিত অপরাধতত্ত্ব প্রতিটি ক্ষেত্রে এদেশের উপযোগী নয়। মনস্তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক অপরাধতত্ত্বের মত ফরেনসিক বিদ্যা সম্পর্কেও এই মতবাদ কম বেশি প্রযোজ্য। এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে জলবায়ুর পৃথক প্রভাবের জন্য এরকম হয়ে থাকে। এই কারণে আমাদের নিজেদের অপরাধবিজ্ঞান নিজেদের গড়ে নিতে হবে।"[২]

অর্থাৎ, তাঁর 'অপরাধবিজ্ঞান' নামক বইটিতে ক্রিমিনোলজির বিভিন্ন বিষয়গুলিকে খুব সুন্দরভাবে উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরে আলোচনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে অপরাধবিজ্ঞানকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন- মনস্তাত্ত্বিক অপরাধ তথা ক্রিমিন্যাল সাইকোলজি, ব্যবহারিক অপরাধ-বিজ্ঞান তথা এপ্লায়েড্ ক্রিমিনোলজি এবং ফোরেনসিক সায়েন্স। এর মধ্যে প্রধানত মনস্তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিভাগ দুটির ওপরে কিছুটা বেশি গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেছেন,

> "ব্যবহারিক বিভাগ বাহিরের এবং মনস্তাত্ত্বিক বিভাগ অন্তরের বিষয়। প্রথমটিতে দেহ মনকে আর দ্বিতীয়টিতে মন দেহকে চালায়। অর্থাৎ উহাদের একটি ওদের শিক্ষা-দিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা বহির্জাত এবং অন্যটি তাদের অন্তর হতে মনস্তাত্ত্বিক কারণে আগত।"[৩]

অপরাধ ও অপরাধীদের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক দিকটি প্রয়োজনীয় হলেও 'মনস্তাত্ত্বিক' দিকটি বিশেষভাবে গুরত্বপূর্ণ এবং আপরাধীদের ক্ষেত্রে প্রধানত মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টির উপর জোর দেওয়াই শ্রেয়। এই মনস্তাত্ত্বিক বিভাগটি আবার তিন রকমের- 'মন-সংক্রান্ত বা সাইকোজেনিক', 'মনস্তাত্ত্বিক বা সাইকোলজিক্যাল', এবং 'মন-সংক্রান্ত বিশ্লেষণধর্মী বা সাইকো অন্যালিটিক্যাল।' এখানে উল্লেখিত মনস্তাত্ত্বিক বিভাগটির মধ্যে তিন নম্বর বিভাগ তথা 'সাইকো-অন্যালিটিক্যাল' তত্ত্বটি অপরাধী মানস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরত্বপূর্ণ। সাইকো-অন্যালিটিক্যাল বিভাগটিতে ব্যক্তির অ-প্রকাশিত 'ইগো'কে দায়ী করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই তত্ত্বের সূচনা, আর এই তত্ত্বের জন্মদাতাহলেন বিখ্যাত দার্শনিক 'সিগমুন্ড ফ্রয়েড'। একথা ঠিক

যে ফ্রয়েড সম্পূর্ণভাবে কোনো অপরাধ তত্ত্বের নির্মাণ করেননি, কিন্তু মন-বিশ্লেষণের আলোচনায় 'ইড', 'ইগো' এবং 'সুপার ইগো' ধারণার উপস্থাপন করে সতন্ত্রভাবে একটি বিষয় বর্ণনা করেন যা মানুষের অপরাধ প্রবণতার কারণ নির্ধারণ করতে প্রবলভাবে সক্ষম। সুতরাং, ইড (Id) হচ্ছে মানুষের প্রকৃত প্রবৃত্তি বা আকাঙ্ক্ষা, ইগো (Ego) হচ্ছে বাস্তব এবং সুপার ইগো (Super Ego) হচ্ছে ব্যক্তির বিবেক বা নৈতিক বৈশিষ্ট্য। ফ্রয়েডের মতানুযায়ী সুপার ইগো সবসময়ই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ইড কে দমন করতে চাই আর ইগো-ইডের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করতে চাই। ইড ও সুপার ইগো হচ্ছে মূলত ব্যক্তিত্বের অ-সচেতন অংশ এবং ইগো হচ্ছে ব্যক্তিত্বের সচেতন অংশ। তাই অপরাধ হচ্ছে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও জৈবিক দিক থেকে অ-সচেতন অংশের প্রতিফলন। বস্তুত, মানুষের মধ্যে যে মূল প্রবৃত্তিগুলি আছে তার দন্দ্বের ফলশ্রুতিতেই মানুষের অপরাধ-প্রবণতার প্রকাশ পাই ও অপরাধ ঘটে। এছাড়া, এই মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু তত্ত্বকে অপরাধ প্রবণতার কারণ হিসাবে তুলেধরেছেন বিভিন্ন অপরাধতত্ত্ববিদেরা। যেমন ইতালীয়ান অপরাধতত্ত্ববিদ 'সিজার ল্যাম্ব্রোসে' যাঁকে 'অপরাধবিজ্ঞানে'র জনকও বলা হয় তিঁনি 'জীববিদ্যামূলক তত্ত্বে'র কথা বলেছেন। এছাড়া আর এক ইতালীয়ান অপরাধতত্ত্ববিদ 'সিজার বেকারিয়া' যে 'ধ্রুপদী তত্ত্বে'র কথাও বলেছেন।

'অপরাধবিজ্ঞান' বা 'অপরাধশাস্ত্রে'র বিশেষ গুরত্বপূর্ণ বিভাগ অপরাধীর অপরাধ মনস্তত্ত্বকে ঔপন্যাসিক 'সায়ন্তনী পূততুন্ডে'র 'সর্বনাশিনী' উপন্যাসটির মধ্যে দিয়ে অপরাধীর অপরাধজগত ও অপরাধীর অপরাধ মনস্তত্ত্বের একটি সূক্ষাতিসূক্ষ বর্ণনাত্মক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে গোয়েন্দা অফিসার রথীন দাশগুপ্তকে বলতে শোনা যায়

> "অন্যাদার ডেথ ফোরকাস্ট! এই নিয়ে তিন নম্বর! খুন কে হবে জানা গেছে। কিন্তু ভগবানই জানেন লাশটা কবে বা কোথায় পাওয়া যাবে!....এরকম খুনী আমি নিজের কেরিয়ারে বাপের জন্মেও দেখিনি! প্রত্যেকবার খুন করার আগে ফেসবুকে ফোরকাস্ট করছে মেয়েটা! সরি, সরি! মেয়ে কিনা স্পষ্ট জানি না। পুরুষও হতে পারে। কিন্তু ফেসবুক প্রোফাইলে একটা মেয়ের ছবিই দেওয়া আছে! পুলিশও সন্দেহ করছে যে, কোনও মেয়ে এর সঙ্গে ডেফিনিটলি যুক্ত আছে। আর সে কি না একটা লোকের মরার আগেই মৃত্যুর ফোরকাস্ট করে বসে থাকে! অথচ কেউ কিছু করতেই পারছে না! এ তো ওপেন চ্যালেঞ্জ!"[৪]

উপন্যাসের প্রথম থেকেই একটি ধোঁয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে একটি প্রশ্ন বার বার উঠে আসছে অপরাধী একটি পুরুষ নাকি নারী? কারণ আমাদের সামনে যে-কোনো রকমের অপরাধ ঘটলে তথাকথিত ভাবে সেই অপরাধের পিছনে একজন পুরুষই থাকতে পারে এই ভাবনাতেই আমরা অভ্যস্ত। সেই অপরাধের পিছনে যে একটি নারীও থাকতে পারে সেটা আমরা দ্বিতীয় বা বিকল্প ভাবনা হিসাবে রাখি না। যদিও বর্তমান সমাজে বেশিরভাগ আপরাধের পিছনে পুরুষদের ভূমিকায় বেশি দেখা যায়, কিন্তু ঔপন্যাসিক সায়ন্তনী পূততুন্ডের এই সর্বনাশিনী উপন্যাসটিতে অপরাধী হিসাবে সনাক্ত করা হয়েছে একজন নারীকেই যে নারী তার অপরাধীমূলক মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে একাধিক খুন করে গেছে এবং সে তার ফেসবুক প্রোফাইলটির নাম দিয়েছে 'সর্বনাশিনী'। কিন্তু এই নারী ও পুরুষ অপরাধীদের অপরাধমাত্রার তুলনা প্রসঙ্গে অপরাধতত্ত্ববিদ 'পঞ্চানন ঘোষাল' তাঁর 'অপরাধবিজ্ঞান' গ্রন্থে বলেছেন,

> "সাম্প্রতিক কালে কয়েকটি পেনাল সেটেলমেন্ট সমীক্ষা ও পরীক্ষা করে মাত্র পুরুষ অপরাধীদের মধ্যে একপ্রকার এগ্রেসিভ ক্রোমোসোমের সন্ধান পাওয়া গেয়েছে। উহা এখন পর্যন্ত স্ত্রী অপরাধীদের মধ্যে পাওয়া যায়নি। এই এগ্রেসিভ ক্রোমোসোম না থাকাতে নারীদের

> মধ্যে হত্যাকার্য ডাকাতাদি আক্রামনাত্মক কম। তবে কদাচিৎ কোন পুংশ্চলী নারীর মধ্যে উহা থাকতে পারে।"[৫]

যে কোন অপরাধের পিছনে অপরাধী হিসাবে একটি পুরুষ না কি একটি নারী-মনস্তত্ত্ব কাজ করছে সেটা একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত। কারণ আপরাধী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অপরাধীর মনস্তত্ত্ব জানাটা খুবই প্রয়োজনীয় আর সেই মনস্তত্ত্ব বুঝতে গেলে সেই অপরাধীর লিঙ্গ পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা বিশেষভাবে গুরত্বপূর্ণ। উপন্যাসটিতে প্রকৃত অপরাধী হিসাবে একজন নারী চরিত্রকেই পেয়েছি, যার আসল নাম 'প্রিয়াবাজাজ'। যে একের পর এক নিজস্ব প্রতিহাংসামূলক অপরাধী চিন্তা-বুদ্ধি দ্বারা শহরের নাম করা বিত্তমান ব্যবসায়ী পুরুষদের হত্যা করেছে যাদের স্ত্রীরা দেখতে অসুন্দর ও কৃষ্ণবর্ণা বলে তাদেরকে ছেড়ে অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, নিজের স্ত্রী দেখতে সুন্দর নয় বলে তার উপর অত্যাচার করে, নিজের পরিবার ছেলেমেয়ের খোঁজ রাখার প্রয়োজন মনে করে না, বিশেষকরে তাদেরকেই বেছে বেছে হত্যা করা হয়েছে। আর সে টাকাওয়ালা বিত্তবান ব্যবসায়ী পুরুষেরা হল সঞ্জীব রায়চৌধুরী, অর্জুন শিকদার ও ব্যবসায়ী বিজয় জয়সওয়ালের মত লোকেরা। এছাড়াও তার হাতে খুন হওয়া ভিকটিমদের মধ্যে নিজের বাবা অ্যান্ড্রু বাজাজ ও নিজের শ্বশুর বিজয় জসওয়ালও আছে। এছাড়া সঞ্জীব রায়চৌধুরী ও অর্জুন শিকদার এরা দুজনে সাংঘাতিক নামকরা বিজনেসম্যান না হলেও, যথেষ্টই বিত্তবান। তারা যতটাই গুনবান ব্যবসায়ী ছিল ঠিক ততটাই সর্বগুণহীন ও চরিত্রহীন ছিল। মদ ও মেয়ের একনিষ্ঠ সাধক। তাদের জীবনে একের পর এক নারী এসেছে। এই প্রবল নারী আসক্তিটিকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে নিজের প্রমের ফাঁদে ফেলে ও পরে তাদেরকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে এসে প্রথমে তাদের সঙ্গে সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্স করে তারপর তাদের শরীরে 'অ্যামাটক্সিন' নামক বিষ প্রয়োগ করিয়ে দেয়, যে বিষটি মানুষের শরীরে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয় না, সময় নিয়ে তিলে তিলে যন্ত্রনা মধ্যে দিয়ে মৃত্যু হয় এবং ভিকটিমের মৃত্যু ঠিক কী কারণে হয়েছে সেটাও বোঝা মুশকিল, তাই ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে

> "সঞ্জীব রায়চৌধুরীর মৃত্যুর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতাই নেই! তাঁর মৃত্যুর কারণ ম্যসিভ লিভার ড্যামেজ, অ্যাকিউট হেপাটিক ও রেনাল ফেইলিওর। তার পাকস্থলীতে কোনওরকম খাদ্য ছিল না। দেহের কোথাও কোনওরকম বিষের অস্তিত্বও পাওয়া যায়নি।"[৬]

ঠিক এরকমভাবে অর্জুন শিকদারেরও মৃত্যু হয়েছে এবং মৃত্যুর পর সকল ভিকটিমদেরকে বিভিন্ন জায়গায় ডাম্প করা হয়েছে।

> "কলকাতা পুলিশ বাইপাসের শুনশান এলাকায় একটা মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহটিকে দেখলেই বোঝা যায় যে মৃত ব্যক্তি খুব সাধারণ মানুষ নয়। লাশের পরনের দামি পরিচ্ছেদ, হাতের লাখখানেক বিদেশী ঘড়ি, দামি রত্নখচিত আংটি, দামি মোবাইল এবং সর্বোপরি মানুষটির অভিজাত চেহারা স্পষ্ট বলে দেয় যে লোক টি রীতিমত অর্থবান! অথচ সেই লোকটির লাশ এরকম বেওয়ারিশ অবস্থায় ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে !"[৭]

মানুষের মেজাজ একবার উন্মাদ বা ক্ষিপ্ততায় পরিণত হলে তারা একদিক থেকে যেমন মানসিক ভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে ঠিক তেমনি অন্যদিক থেকে তারা নৈতিকতাহীন মানসিকতায় আরো বেশি হিংস্র হয়ে যায়। সেই উন্মাদ বা হিংস্র হওয়ার পিছনে তার যত খারাপ বা ধোঁয়াসাচ্ছন্ন জীবনই থাকুক না কেন, সেটা আর কারোর দৃষ্টিগোচরে আসে না, বিশেষত আইনের দৃষ্টিতে একদমই না। তার পিছনে যে Motive থাকুক না কেন, যেটা ক্রাইম সেটা ক্রাইম। অপরাধী প্রিয়া বাজাজের হাতে খুন হওয়া তার সমস্ত ভিকটিমদের মধ্যে সর্বপ্রথম নিজের বাবা অ্যান্ড্রু বাজাজকে নিজের হাতে খুন করে তার দেহটিকে তাদের বাড়িতেই পুঁতে দিয়েছিল।

তার বাবা অ্যান্ড্রু বাজাজ তার মা অহল্যা বাজাজের ওপর দিনের পর দিন অবহেলা ও অকথ্য অত্যচার করতো শুধুমাত্র তার মা দেখতে ময়লা বা অসুন্দর ছিল বলে। তার কাছে নিজের স্ত্রীগুণ ও ভালোবাসার পরিবর্তে সৌন্দর্যটাই তার কাছে অধিক প্রাধান্য পেয়েছিল। মেয়ে প্রিয়া বাজাজ এসব অত্যাচার নিজের চোখে দেখতে দেখতে বড়ো হয়েছিল। বাবা অ্যান্ড্রু বাজাজ স্ত্রী থাকা সত্বেও নিজের বাড়িতে অন্য নারীদের নিয়ে এসে তাদের সঙ্গে মেতে থাকত, মা অহল্যা বাজাজ বছরের পর বছর এসব কষ্ট চুপ করে সহ্য করে যেতো এবং একদিন ছোট মেয়ে রিয়া বাজাজকে জন্ম দিতে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে অ্যান্ড্রু বাজাজ তার মেয়েদের ওপরও প্রচণ্ড মার-ধর ও অত্যাচার করতে লাগলো এবং একদিন মেয়ে প্রিয়াবাজকেই মেরে বাড়ি থেকে রাস্তাই ফেলে দিয়ে এসেছিল কিন্তু, প্রিয়া বাজাজ সে-সময় প্রাণে বেঁচে গেলেও তার স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়। যদিও পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সে ঠিক হলে একদিন প্রিয়া বাজাজই তার বাবা অ্যান্ড্রু বাজাজকে নিজের হাতে হত্যা করলো-

> "চোখের পলকে সামনের টেবিল থেকে তুলে নিল তুরস্কের সেই কুখ্যাত ছুরি! মিঃ বাজাজ কিছু বোঝার আগেই তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মেয়েটা। পাগলের মতো কোপের পর কোপ মারতে মারতে বলল 'শয়তান! স্কাউন্ড্রেল! আমাদের সবার লাইফ নষ্ট করেছ তুমি....। কী ভেবেছ? তুমি ডিক্টেটর? যা বলবে, যা করবে সব চুপচাপ সহ্য করতে হবে? .... ইউ বা-স্টা-র্ড !... নে!..নে...এই নে!"[৮]

ছুরির আঘাতে শুধুমাত্র কেঁপে উঠেছিল তার নিথর দেহটি, তার মুখ দিয়ে একটা কাতরোক্তি বা সামান্য শব্দটুকু করারও সুযোগও পাননি শুধু কাত হয়ে পড়লেন আরামকেদারার ওপরে। প্রিয়া বাজাজ নিজের মায়ের অত্যাচার ও যন্ত্রনার প্রতিবাদস্বরূপ তার বাবাকে নিজের হাতে খুন করার পর তার মেজাজ আর ক্ষিপ্ত বা উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল, কারণ যখন দেখল যে বাড়িতে তার বিয়ে হয়েছে সে বাড়িতেও সেই একই অত্যাচার ও অবহেলার স্বীকার তার নিজের শাশুড়িমা। ভাগ্যক্রমে তার মায়ের নামেই নাম তার শাশুড়িমার। তার জীবনে আর এক অহল্যার প্রত্যাবর্তন। ঠিক তার নিজের মায়ের মতই কৃষ্ণাঙ্গী, গুণী, ব্যক্তিত্বময়ী গৃহিনী। প্রিয়া বাজাজ নিজের মা কে হারিয়ে তার বদলে পেয়েছিল সমগুণ সম্পূর্ণা আর একজন মা'কে। কিন্তু যখন দেখলো তারও ঠিক সেই একই অবস্থা ঠিক তখনি তার মাথায় পুনরায় রিভেঞ্জের নেশা চড়ে বসল আবার তার সুস্থ মস্তিষ্ক উন্মাদী হয়ে উঠলো এবং সে ঠিক করেছিল কিছুতেই সেই একই অন্যায় আর হতে দেবে না। ফলত তার শ্বশ্বড় ডঃ বিজয় জসওয়ালকেও খুন হতে হল তার হাতে। আর অন্যদিকে সঞ্জীব রায়চৌধুরী ও অর্জুন শিকদারকেও ঠিক একই স্বভাবের কারণে তাদেরকেও খুন হতে হল। ফলত এই হত্যালীলাকে 'সিরিয়াল কিলিং' এর নাম দিয়ে এই মনস্তাত্ত্বিক খেলাটাকে খুব সুন্দর ভাবে খেলতে চেয়েছিল।

একজন অপরাধীর পারফেক্ট ক্রাইম করার পিছনে তার চিন্তা-চেতনা, সু-পরিকল্পনা ও সুক্ষ ভাবনারও বিশেষ গুরত্ব রাখে। যদিও কোন ক্রাইম কখন 'পারফেক্ট ক্রাইম' হয় না। তবুও অপরাধীরা তাদের মনস্তত্ত্বকে সঠিক ভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে, যে ভাবে উপন্যাসের অপরাধী নারী চরিত্র প্রিয়া বাজাজও নিজের মনস্তত্ত্বকে কাজে লাগিয়েছে। প্রিয়া বাজাজ প্রত্যেক ভিকটিমকে খুন করার সময় খুব নিখুঁত ভাবে প্লান করেছেন। বিশেষকরে নিজের শশুরকে হত্যা করার সময় পুলিস আগেই স্টেপ নিয়ে নেবে সেটা সে জানত, তাই সে দাবাড়ু চাল দেওয়ার মত করে জুয়েলারী বিজয় জয়সওয়ালকেই কিডন্যাপ করে নিয়েছিল, যাতে করে পুলিশ বুঝতে পারে যে অপরাধী জুয়েলারী বিজয় জয়সওয়ালকে খুন করতে চলেছে, তাহলে পুলিশ জুয়েলারী বিজয় জয়সওয়ালকে খুঁজবে বা তার দিকে পুলিশের নজর থাকবে আর সেই সুযোগে অপরাধী খুব সহজেই ডঃ বিজয় জয়সওয়ালকে খুন করতে পারবে। ফলত সেটাই হল, অর্থাৎ ডঃ বিজয় জয়সওয়াল খুন হয়ে গেল আর

জুয়েলারী বিজয় জয়সওয়ালকে ড্রাগ দিয়ে শুধুমাত্র অর্ধচেতন অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিল। 'অ্যামাটক্সিনে'র মত বিষের ব্যবহার অপরাধীকে অনেকটাই পরিকল্পনাপ্রবন, সূক্ষচিন্তন ও বুদ্ধিমান হিসাবে চিহ্নিত করে।

সর্বনাশিনী ওরফে প্রিয়া-বাজাজ, যে বছরের পর বছর ধরে দেখে আসা তার বাবার বর্ণবিদ্বেষীমূলক মনভাব ও তার মায়ের প্রতি সেই অত্যাচার ও অবহেলার দৃশ্যগুলিকে সে কখনই ভুলতে পারেনি আর শুধু প্রিয়াবাজাজ কেন কোনো মেয়ের পক্ষেই সম্ভব নয় এসব ভুলে যাওয়া। সুতরাং সে বারবার সুন্দেরের বিরোধীতা করেছে, যা কিছু সুন্দর সে সবকিছু তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠতো, দাবা খেলার সময় পর্যন্ত সাদা ঘুঁটি ও কালো ঘুঁটির মধ্যে কালো ঘুঁটিকেই পচ্ছন্দ করেছে আবার সে যখন নিজেই দাব খেলতে বসেছে তখন সে সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলেছে এবং কালো রানিকে জিতিয়েছে। এছাড়াও সে নিজের হাতে ট্যাটু বানিয়েছিল সেখানেও দেখা গিয়েছিল সেই সাদা-কালো বর্ণের গোপন মনস্তত্ত্বের প্রকাশ। অপরাধী প্রিয়াবাজাজ তার হাতে 'রেড-ব্ল্যাক স্পাইডারম্যান' ট্যাটু বানিয়েছিল। এ স্পাইডাম্যান ট্যাটুর বিষয় প্রসঙ্গে এই কেসের ভারপ্রাপ্ত সি.আই.ডি অফিসার 'অধিরাজ ব্যানার্জি' তার টিমের অন্যান্য অফিসারদেকে বলেছেন সর্বনাশিনীর গভীর মনস্তত্ত্বের কথা

> "একবার স্পাইডারম্যানের কনসেপ্ট থেকে বেরিয়ে আসুন তবেই বুঝবেন। স্পাইডার ম্যান সুপার হিরো। কিন্তু যদি তাকে নজর আন্দাজ করেন তবে কী পাবেন? একটা লাল কালো রঙের মকড়সা! লাল কালো কম্বিনেশনের অনেক মাকড়সাই আছে। কিন্তু আমার পাপী মনে একটা বিশেষ মাকড়সারা পুরুষ মাকড়সাদের সঙ্গে সেক্স করে মেরে ফেলে! আমাদের সর্বনাশিনীও ঠিক সেই কাজটিই করেছেন! তার প্যাটার্নও সেই এক। পুরুষদের সঙ্গে সেক্স এবং খুন!"[৯]

এছাড়াও প্রিয়াবাজাজ নিজেও দেখতে খুব সুন্দরী তার বাবার মতোই। তার বাবা অ্যান্ড্রু বাজাজের চেহারাও রীতিমত হ্যান্ডসাম, গায়ের রঙ সাদা ও লম্বা। সে তার বাবাকে হত্যা করলেও তার বাবার থেকে পাওয়া সে সৌন্দর্য তাকে ছেড়ে যায়নি, সে এ সৌন্দর্যকে মুছে দিতে চেয়েছে, কোনো অস্তিত্ব রাখতে চাইনি। তাই সে প্রতিনিয়ত নিজের রূপ-সৌন্দর্যের যন্ত্রনাকে মেনে নিতে পারতো না।

> "সে সামনের আয়নার দিকে তাকায়। আচমকা মনে হল, সেই বিশ্বাসঘাতক পুরুষটা ওর ঠিক পেছনেই এসে দাঁড়িয়েছে। ওর পিছনে তারই ছায়া! সুন্দর কোমল মুখটা শক্ত হয়ে ওঠে। এখনও তাকে ছেড়ে যায়নি সে! আজও ঠিক তেমনি আছে। সেই ঘৃণিত লোকটা!"[১০]

সে বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়িয়ে একটা ওড়না দিয়ে বদ্ধ উন্মাদের মতো আয়নাটা মুছে ফেলতে থাকে, তার মনে হয়েছে 'ওর বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব রাখা যাবে না। পুড়িয়ে ছারখার করতে হবে নয়তো বারবার জিতে যাবে সাদা রাজা! কালো রানির হার নিশ্চিত! হেরে যাবে ওর সমস্ত সুভাকাঙ্খা, হেরে যাবে শুভবুদ্ধি। যেটুকু মমতা বুকে এখনও লুকিয়ে আছে সেটুকুও হারিয়ে যাবে। হৃদয় নিংড়ে শুধু ঘৃণাই দিয়ে যাবে ও আজীবন!' তাই সে তারা বাবার সৌন্দর্যের কোনোরকম ছায়া যাতে না থাকে তাই সে নিজের মুখের কসমেটিক সার্জারি করে নিজের সুন্দর চেহারাকে বদলে কুৎসিত রূপই গ্রহণ করেছিল কিন্তু তার গায়ের সাদা রঙের তো পরিবর্তন করা যাবে না, তাই সে ঠিক করেছিল এ সৌন্দর্য যন্ত্রনা বোঝা সারাজীবন বয়ে বেড়ানোর থেকে নিজের জীবন না রাখাই ভালো তাই সে নিজেকেও মেরে ফেলতে চেয়েছিল। যদিও শেষ মুহূর্তে অফিসার অধিরাজ ব্যানার্জি ও তার টিম এসে অপরাধী প্রিয়া বাজাজকে বাঁচিয়েছিল। তখন তাকে বলতে শোনা গিয়েছিল

> "নিজেকে নয়, ঐ শুয়োরের বাচ্চাটাকে মারতে চেয়েছিলাম! অ্যান্ড্রু বাজাজ!...ঐ কুত্তাটার মতো দেখতে হয়েছি যে! মহাপাপ করেছি! কসমেটিক সার্জারি করে মুখটাকে পালটাতে পেরেছি। কিন্তু স্কিন! এই সাদা চামড়া যাবে কোথায়! মেডিক্যাল রিপ্রেজন্টেটিভের চাকরি নেওয়ার

পেছনেও এই একটাই কারণ! রোদে পুড়ে পুড়ে যদি চামড়াটা তামাটে হত তবে শান্তি পেতাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না! যতবার আয়নায় নিজেকে দেখি ততবার নিজের ওপরেই ঘেন্না হয়! ততবার নিজের পিছনে অ্যান্ড্রু বাজাজকে দেখতে পাই! সেই সাদা চামড়া, যার জন্য আমার মা শেষ হয়ে গিয়েছিলেন! দেখতে পা লোকটা ব্যঙ্গের হাসি হাসছে। একমাত্র আমি মরলেই ঐ লোকটা হারত। পুরো চেকমেট!"[১১]

বিশেষত মনসিকভাবে ভারসাম্যহীন অপরাধীদের মধ্যে নিজের ভুলকে স্বীকার না করার একটা মানসিকতা তৈরি হয়, শুধু তাই নয় তারা বিভিন্ন যুক্তি তর্কের মধ্যে দিয়ে নিজেদেরকে ঠিক প্রমান করার চেষ্টা করে সে অপরাধী পুরুষ হোক বা নারী। আর এই উপন্যাসের প্রধান অপরাধী 'প্রিয়া বাজাজ' ওরফে 'শীনা জয়সওয়াল' ওরফে 'অ্যালিস'ও ঠিক সেরকমই মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। এবং সে অফিসারদের উদ্দেশ্যে বলেছে

"বে--শ করেছি! আপনারা কী বুঝবেন! আমি চোখের সামনে নিজের মা কে একটু একটু করে রোজ মরতে দেখেছি। কিচ্ছু করতে পারিনি।... তিনি তার গোটা জীবন-যৌবন একটা অপদার্থ পুরুষকে দিয়েছিলেন। সেই লোকটার সংসারে খাটতে খাটতে মুখে রক্ত তুললেন! একজন নারীর যা গুণ থাকা দরকার ছিল তাঁর বিনিময়ে কী পেলেন? শুধু যন্ত্রণা! নিজের স্বামীর বিছানায় বসার অধিকার তাঁর ছিল না!... রোজ স্বামীর সঙ্গে অন্য নারীকে শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে দেখাটা কী প্রচন্ড অপমানের, কী ভীষণ যন্ত্রণার তা বোঝেন আপনারা? লোকটা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, তুমি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় জিনিস! কেন? শুধু তার গায়ের রঙ কালো বলে! এটা কী জাতীয় ন্যায়! গায়ের রঙ কালো হলেই সে অসুন্দর? কেন? কোন শাস্ত্রে লেখা আছে? শুধু গায়ের রং কালো বলে তাঁর আর কোনও গুণই গ্রহণযোগ্য নয়!"[১২]

বলতে গেলে এসব যুক্তি-আদর্শের পাহারের স্তম্ভ খাড়া করলেও আইন সমসময় আইনের রাস্তাতেই চলে, অপরাধ কে অপরাধ বলেই মান্যতা দেয়, সে অপরাধ ছোট হোক বা বড়। অর্থাৎ এই আইনের বিচার থেকে অপরাধী প্রিয়া বাজাজ কোনো মতেই ছাড় পাবে না, আর সে ছাড় পেতেও চাই না। এমনকী সে তার নিজের ওই অপকর্মের জন্য কোনো রকম অনুশোচনাবোধও করেনি। সে বার বার যন্ত্রনার আষ্টেপিষ্টে বেঁধে থাকা মন ও মেজাজ নিয়ে চিৎকার করে বলে গেছে 'বে---শ করেছি, বে----শ করেছি।' ফলত এই বিকৃত মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় ভুক্তভোগী অপরাধীদের এরকম আচরণই গ্রহণযোগ্য। তাকে আইনের কথা বলতে গেলে সে বলে-

"আইন দেখাচ্ছেন! কীসের আইন মশাই! আপনাদের আইন একদিকে ডিভোর্স করতে গেলে বলে সন্তানদের কথা ভাবুন, আর অন্যদিকে সেই আইন-ই এক্সট্রাম্যারিটাল অ্যাফেয়ারকে লিগ্যাল বলে! ন্যাকামি! তখন সন্তানদের কথা মনে পড়ে না? বাপ যদি মাকে ফেলে দিনের পর দিন অন্য মেয়েদের সঙ্গে ঘোরে তাহলে সন্তানদের কেমন লাগে জানে আপনাদের আইন? আমি জানি!... আইন স্রেফ দাঁড়িপাল্লা ধরানো গান্ধারী! আইন মানে, ব্লাডি ব্লাইন্ড ফুল!... যে বাস্টার্ডগুলোকে আমি মেরেছি, সে শালারা আমার প্রেমে পড়ে নিজেদের বৌকেই মারার তালে ছিল! আমি বাধা দিয়েছিলাম, পালিয়ে যাওয়ার লোভ দেখিয়েছিলাম বলে সেই মহিলারা এখনও বেঁচে আছে! কেন? তারা কালো বলে? সান অফ আ বিচ! সবার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে! তাদের কী অবস্থা হত? আমি আর রিয়া যেমনভাবে মরেছি, মরছি তারাও মরত!... তাই আমিও সবকটাকে তেমনই যন্ত্রণা দিয়ে মেরেছি। বেশ করেছি শালাদের মেরেছি! ওদের এভাবেই মরা উচিত! প্রিয়া এবার আরোও হিংস্র বলে, বে---শ করেছি। ওরা যত কষ্ট পেয়েছে---- আমি ততই আনন্দ পেয়েছি! সুযোগ পেলে আরও মারতাম!"[১৩]

ফলত উপন্যাসের এই অপরাধীর অপরাধের কারুকার্য ও তাদের চিন্তা, ভাবনা, উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা এসব বিষয়গুলিই তাকে প্রকৃত অপরাধী হিসাবে নির্ণিত করেছে। আপরাধবিজ্ঞানের ভাষায় আমরা সকল অপরাধীকে প্রকৃত অপরাধী বলতে পারি না। একজন অপরাধীকে প্রকৃত আপরাধী হিসাবে নির্বাচন করতে উদ্দেশ্য, লক্ষণ ও তার অপরাধকার্যের দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। আর এই প্রকৃত আপরাধী নির্ণয়ের প্রসঙ্গে অপরাধতত্ত্ববিদ পঞ্চানন ঘোষাল তাঁর 'অপরাধবিজ্ঞান' বইটিতে বলেছেন-

> "প্রকৃত অপরাধীদের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে উহার একটি পরিসংজ্ঞা তথা ডেফিনেসন সম্বন্ধে ধারণার প্রয়োজন আছে। মানুষ অভাবের তাড়নাতে কিংবা অবস্থাগতিকে একাধিকবার অপরাধ করলেও তজ্জন্য তারমধ্যে অনুতাপ ও লজ্জাবোধ থাকলে সে প্রকৃত অপরাধী নয়। কিন্তু সেই ব্যক্তি অনুতাপ ও লজ্জাবোধ হারানো মাত্র প্রকৃত অপরাধী হবে। আর প্রকৃত অপরাধীর মধ্যে আটটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যেমন- গুরতর, সর্ব-স্বীকৃতি, পূর্ব-কল্পিত, আদর্শহীন, অসামাজিক, জ্ঞানত, স্বার্থযুক্ত ও স্বেচ্ছাকৃত।"[১৪]

স্বাভাবিকভাবেই উপন্যাসের প্রধান অপরাধী প্রিয়া বাজাজের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যগুলি প্রবলভাবে বিদ্যমান। এই প্রিয়া বাজাজ সুস্থ মস্তিষ্কে পরিকল্পিত ভাবে প্রতিহিংসা বা বদলা স্বরূপ একাধিক হত্যা করে গেছে, আর এই হত্যাকারী অপরাধীদের একটি অপরাধ স্পৃহা কাজ করে যাকে অপরাধতত্ত্ববিদ পঞ্চানন ঘোষাল 'শোনিত স্পৃহা' নাম দিয়েছেন। যাকে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ বলা হয়েছে। এই শোণিত স্পৃহার দুটি ভাগ- যৌনজ ও অ-যৌনজ। খুন-যখম হচ্ছে অ-যৌনজ এবং বলৎকার-ব্যাভিচার হচ্ছে যৌনজ অপরাধ। এই শোণিত স্পৃহাই সায়ন্তনী পূততুন্ডের উপন্যাসের প্রধান অপরাধীর মধ্যে দেখা গিয়েছে। এই শোণিত স্পৃহা কে 'থাস্ট ফর ব্লাড' বলা হয়েছে। বস্তুত এই অপরাধীদের শোণিত স্পৃহা সম্পর্কে ডঃ পঞ্চানন ঘোষালের ব্যাখ্যামূলক সংজ্ঞার মধ্যে দিয়ে এই আলোচনা ইতি সমাপ্তি করবো, তিঁনি বলেছেন,

> "মানুষ বন্য অবস্থাই নিহত জন্তু বা ব্যক্তির শোণিত পান করে তৃপ্ত হত। কালক্রমে ওই অভ্যাস পরিত্যাক্ত হলেও প্রদমিত অবস্থাতে উহা আমাদের মধ্যে আজও বর্তমান। আজও কোন কোন মানুষ শোণিতাত্ত্বক অপরাধীদের মত রক্ত দর্শনে আনন্দ পায়। রক্তপান আধুনা রক্তদর্শনে পরিনত হয়েছে। বহু অপরাধী আজও রক্ত দর্শনে পরিতৃপ্ত হয়। এই জাগ্রত শোণিত স্পৃহার জন্য হত্যাকারী বিপদ অগ্রাহ্য করেও বারে বারে হত্যাস্থলে ফিরে এসেছে। সুপ্ত শোণিত-স্পৃহা জাগ্রত হলে এইরূপ প্রায় ঘটে থাকে। উহা এভাবে প্রশমিত না করলে হত্যাকারী শান্তি পায়না।"[১৫]

তথ্যসূত্র:

১) Caldwell, Robert. Criminology. University of Pennsylvania prees, Philadelphia, 1956.

২) ঘোষাল, পঞ্চানন ড.। অপরাধ বিজ্ঞান। বাক-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড ৩৩, কলেজ রোড, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৬৩, জুলাই, পৃ. ১।

৩) তদেব, পৃ. ১৮৯।

৪) পূততুন্ড, সায়ন্তনী। সর্বনাশিনী। বিভা পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০১৯, পৃ. ২১।

৫) ঘোষাল, পঞ্চানন ড.। অপরাধবিজ্ঞান। বাক-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড ৩৩, কলেজরোড, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩ জুলাই, পৃ. ২৫।

৬) পূততুন্ড, সায়ন্তনী। সর্বনাশিনী। বিভা পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০১৯, পৃ. ২৩।

৭) তদেব, পৃ. ২২।
৮) তদেব, পৃ. ৪২।
৯) তদেব, পৃ. ৩৩৬।
১০) তদেব, পৃ. ১৯১।
১১) তদেব, পৃ. ৩২৬।
১২) তদেব, পৃ. ৩২২।
১৩) তদেব, পৃ. ৩২৬।
১৪) ঘোষাল, পঞ্চানন ড.। অপরাধবিজ্ঞান। বাক-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড ৩৩, কলেজরোড, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩ জুলাই, পৃ. ১০।
১৫) তদেব, পৃ. ২৭।